চেনা নগরে অচিন সময়ে

সরোজ মেহেদী

উৎস প্রকাশন

প্রকাশনার চব্বিশ বছর
উৎস প্রকাশন

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৬৭৬০২৫, ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪
ই-মেইল : utsopro@yahoo.com

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স
৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

দাম : ৪৪০ টাকা

ISBN : 978-984-98159-6-9

উৎসর্গ

আমার অনাগত ঔরসকে
এই অলীক আশায়,
একদিন সে আমার লেখক হতে চাওয়ার দুঃখ ঘোচাবে...

মুখবন্ধ

এই বইয়ের কোনো মুখবন্ধ নাই।

নিচের কথাগুলো বলার জন্য বলা বা সময়ের কাছে দেওয়া আমার বেহুদা জবানবন্দি মাত্র।

লিখি লিখি করে অনেক কিছুই লেখা হয় না। এভাবে কতো চিন্তা যে মাথা থেকে হারিয়ে গেছে! অনেক লেখা অর্ধেকে গিয়ে থমকে আছে। শেষ আর হয় না। এই না হয়ে ওঠার পিছনে একদিকে আলস্য আছে আর অন্যদিকে আছে জীবিকার জন্য 'জীবন' বস্তুটার প্রি-ম্যাচিওর যবনিকাপাত! আধুনিক যুগের 'গাধামনী-গাধাকান্ত' চাকরির বেগার খাটা শেষে আর লেখার শরীর অবশিষ্ট থাকে না। মন যেন শরীরের সাথে পাল্লা দিয়ে আরও বেশি নেতিয়ে পড়ে। তবু অভ্যাস বলে কথা। লেখক না হয়ে উঠেও মাঝেমধ্যে লিখতে বসতে হয়। লিখতে গিয়ে মনোযোগ হারিয়ে শুনতে হয় নিজেকে নিজের দেওয়া মন্দচারী। অবশ্য এসব অনুযোগ-অভিমান-আফসোস শেষে আমি স্বীকার করে নেই, বহু মানুষ এই ছাইপাশ লেখার জন্যই আমাকে ভালোবাসে। 'আমি লেখকের' জন্য জীবনের সবকিছু উজাড় করে দিবে বলে নাছোড়বান্দা হয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। আর কিছু না হোক তাদের জন্য কিছু না কিছু লিখে যেতে হয়। লিখতে ইচ্ছে করে। যারা আমাকে পছন্দ করে না তারা কখনো আমার চিন্তায় থাকে না। কিন্তু আমাকে যারা ভালোবাসে বলে, তারা কেবল মাথার ভেতরে ঘুরঘুর করে। এই ভালোবাসার মানুষগুলোর আবদার রাখতে গিয়ে আমাকে লিখতে হয়।

যাহোক, ভারত থেকে ফেরার সময় যখন শুনলাম কোয়ারেন্টিন করতেই হবেই, ১৪ দিনের বন্দিজীবন তখনই চিন্তা করেছিলাম এই সময়টা নিয়ে লিখব। হয়ত ১৪ দিন শেষ করে ঢাকা ফিরে গিয়ে লিখব বলে ভাবতাম। পরে 'লিখব' 'লিখব' করে এবারও আর লেখা হতো না। ফলে এবার আর 'করব' 'করব' বলে কোনো কথা রইল না। করা শুরু করে দিলাম।

হাতে অখণ্ড অবসর। ভাবলাম এখনই লিখি। নাহ্ এখনই। লিখতে লিখতে দেখি অনেক কথা। যে কথার কোনো কূল নাই, কিনারাও নাই। আমিও তো জন্ম

থেকেই পথে, ঠিকানাহীন জীবনে! 'যে পাখি ঘর বোঝে না/উড়ে বেড়ায় বনবাদাড়ে'র জীবন। তারপর ভাবলাম এসব কথা দিয়ে একটা বই করি। আমার কথাগুলো আমার মতো করে লিপিবদ্ধ থাকুক। অন্তত আমার স্বাক্ষর এই পৃথিবীর আনাচেকানাচে কোথাও পড়ে থাকল। হাজার বছর পর পথের ধারে কুড়িয়ে পেয়ে কেউ একজন স্মৃতিকাতর হয়ে গেলে মন্দ কি!

অনেকেই প্রশ্ন করে–বাংলা সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতা পেয়ে গেছে, সাহিতের সেরা সময় বিংশ শতকে কাটিয়ে এসেছে, এমন কিছু নেই যা লিপিবদ্ধ হয় নি, তবু নতুন লেখা কেন দরকার? আমার মনে হয় 'সবকিছু হয়ে গেছে' টাইপ সিদ্ধান্তে আসার পরও নতুন কারো নতুন করে লেখার দায় থেকে যায়।

আমি লিখি লেখার প্রতি টান অনুভব করি বলে। তবে নিজের লেখা নিয়ে কোনো দাবি নেই। কেউ পড়লে খুশি, না পড়লেও খুশি। খুব ভালো লেখার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছি বলে কখনো মনে হয় না। বাংলা ভাষাটাও ঠিকঠাক জানি তা না। তবে নিজে যা বুঝি, যা অনুভব করি, যা দেখি তা নিজের মতো করে বলার জন্য হলেও লিখতে চাই–এই হলো কথা। আমার কাঁচা হাতের বাংলা তাই আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ভেতর থেকে কে যেন বলে–রাখো তোমার দুর্বলতা। লেখো, লেখো। তোমার দুর্বল লেখা থেকে উপাদান নিয়েই হয়ত কেউ একজন মারাত্মক সব সবল লেখা লিখবে। সেই লেখায় তুমি ছায়া হয়ে জাজ্বল্যমান থাকবে।

কেন লিখতে চাই? কারণ আমি যে জীবন যাপন করেছি তা করার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের হয় নি। তাঁরা আমার মতো একবিংশ শতাব্দীতে সাদাসিধে এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠেন নি। সুতরাং আমি ঠিকঠাকমতো বলতে না পারলেও আমার কথাগুলো তাঁদের থেকে ভিন্ন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভিন্ন কথামালা একজনও শুনতে চাইবে না এটা কী করে হয়?

আমি বিশ্বাস করি—আমার গল্প বলার নিজস্ব একটা ভঙ্গি আছে। আমার গল্পে আমার বেড়ে ওঠার, পারিবারিক ইতিহাসের, সেই জনপদের মানুষের, তাদের বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আমি যেভাবে বলতে চাই এভাবে বলার 'সাহস দেখায়' সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে খুব কমজনই। আমার যে সাহস তার সিকিভাগও রবি বাবুর ছিল না। এই সাহসটা যদি একজনকেও অনুপ্রাণিত করে দোষের কি!

লেখাটা এজন্য দরকার যে বিংশ শতাব্দীর মহান সাহিত্যিকেরা একবিংশ শতাব্দী দেখেন নি। ফলে একবিংশ শতাব্দীর মানুষের অনুভূতি তাদের পক্ষে ধরা সম্ভব না। আমি লিখে যাই একবিংশ শতাব্দীর এই সময়কে ধরার জন্য। আমাদের গুরুজনদের লেখায় ফেসবুক জামানা অনুপস্থিত। সুতরাং ফেসবুকের এই অস্থির ও

অদ্ভূত সময়ে জীবন কেমন ছিল তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিখে রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

করোনা মহামারির সময়ে (২০২০/২০২১ সাল দ্রষ্টব্য) আমি যেভাবে চণ্ডীগড় থেকে বেনাপোল হয়ে বাংলাদেশে এসেছি সেভাবে নজরুল আসেন নি। মানিক বা বিভূতি আমার মতো কোয়ারেন্টিনে ছিলেন না। ফলে কোনো পাঠক যদি কখনো কোয়ারেন্টিন নিয়ে কিছু পড়তে চায় তখন আমার লেখা কাজে লাগবে। এভাবেই মূল সাহিত্যের কাজে লেগে যায় মাইনর সাহিত্য। আমার এই বইটি মাইনর সাহিত্য না মেজর সাহিত্য তা বলার সময় এটা না। আমি শখের লেখক না আসলেই লেখক তা-ও সময়ই বলে দেব। এই বইটা না ভ্রমণ কাহিনি না নিটোল কোনো রসালো গদ্য। কী? জানি না। এই বইয়ের শ্রেণিবিভাগও ভবিতব্য নির্ধারণ করুক। শুধু এতটুকু বলি–এই বইয়ের পাতায় পাতায় সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির সরব উপস্থিতি রয়েছে।

এটা কী তা মূল্যায়নের ভার পাঠকের হাতে। একজন পাঠকও যদি আমার বইটি পড়ে আমি সেই একজনের জন্য আরেকটা বই লিখব। লেখাটা আমার কাছে নেশার মতো, গল্প বলে যাওয়াটা এক ধরনের উদ্ভট পাগলামি। ঐ যে বললাম পেটের টানে পিঠে সবসময় ভারী বোঝা থাকে বলে সাধ থাকলেও লেখার জন্য সময় হয়ে ওঠে না। তবু মৃত্যু ছাড়া এই পাগলামি থেকে নিস্তার পাওয়ার আর কোনো পথ দেখি না। আর কিছু না হলেও লিখতে না পারার আফসোস নিয়ে মরতে তো পারব! এই আফসোসে যে সুখ আছে তা এক পৃথিবী সমান পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। না এবং না। এই সত্য বোঝার মুরোদ ভদ্দরপাড়ার ভদ্দরজনদের বেশিরভাগেরই নেই। আদতে তাদের কাছে শিক্ষা বা আধুনিকতা কোনটাই নেই।

বই রচনার কাল

[আমি ভারতে গিয়েছিলাম ২০২১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি। তারপর সাত দিনের কোয়ারেন্টিনে ছিলাম চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোবিন্দ হোস্টেলে। কোয়ারেন্টিন শেষ হলে আমার জায়গা হয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ছাত্রাবাস এনসি-৬ এ। আমি দেশে ফিরি ২০২১ সালের ৮ই জুন। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর তরী বেয়ে তীরে এসে শুরু হয় ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন জীবন। স্থান, গাজীর দরগা, ঝিকরগাছা, যশোর। প্রথম রাত ডিম খেয়ে ঘুম দিয়ে কেটে গেল। পরদিন সকাল গড়িয়ে বিকেলে ঘটে লঙ্কাকাণ্ড। তারপর আবার দিন আসে দিন যায়। কথা থাকে, কথা বয়ে যায়। এভাবে যেতে যেতে ২২শে জুন কোয়ারেন্টিন জীবন শেষ হয়। সেদিন একদিকে সরকারের আরেকবার হাস্যকর 'কঠোর এবং কঠোর' লকডাউন ঘোষণা, অন্যদিকে ঝুম বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই এবার ঢাকা ফেরার পালা। যেন আমি যশোর ছাড়ছি বলে ঘুম থেকে উঠে মাকে না পাওয়া মাস ছয়েকের শিশু হাত-পা ছুড়ে বিলাপ করছে! এভাবে ভাবতে গিয়ে আমি আর্দ্র হই। আহারে অবোধ!]

চেনা নগরে অচিন সময়ে

চেনা নগরে অচিন সময়ে

কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে মাথায় যেন বাজ পড়ল! বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, চারপাশে সুনসান নীরবতা। দিনরাত ভিড়ভাট্টায় জেরবার হয়ে থাকা এই অঞ্চল যেন মানুষের অভাবে খাঁ-খাঁ করছে! দেখে ডর ডর লাগে! বাইরে চোখ রেখে মনে হলো—

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে...

এই সন্ধ্যারাতে কাল (আগামী) কীভাবে কী করব সেই ভাবনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি। তার চেয়েও বেশি অস্থির করে তুলছে পেটের খাই খাই ও শরীরের শুই-শুই প্যানপ্যান। পেট ও পিঠের সে কী ঐক্য! মশা ও মাছির যেমন! যুগ যুগ ধরে একই বিছানায় শুয়ে, একই থালায় খেয়েও তারা ভাই ভাই। ঝামেলা নং তপস্য কেবল মানুষের বেলাতেই। মানুষ আসলেই ঝামেলার বস্তু। আমাদের মওলানারা আখেরাতে চিরস্থায়ী শান্তির কথা বলে দুনিয়ায় নিজেরা নিজেরা অশান্তি আর অনৈক্যের সাতকাহন করে বেড়ায়; জাহাজে-গোলাপে, গুঁতাগুঁতি-মারামারি লাগায়। তারা যদি মশা ও মাছিকে দেখে কিছুটা শিখত, যদি পেট ও পিঠের ঐক্যগাথা বুঝত! সাথে লাগেজ-ব্যাগ-এসবের ঝামেলা না থাকলে কোথাও শুয়ে পড়া যেত। সেটা আর হচ্ছে না। লকডাউন বলে রাস্তায় হাঁটারও উপায় নেই, পুলিশ ধরে প্যাঁদাবে।

এক পথচারী গলগলায়—'মেইন রোডে গেলে পুলিশ ধরে এমন প্যাঁদানি দেবে না দাদা, একদম ১০ দিন শ্রীঘরে!' জীবনে অনেক কিছুই হয়েছে, এখনো শ্রীঘর দেখা হয় নি। গেলে অবশ্য মন্দ হয় না! আরেকটা জীবন দেখে আসা গেল, তবে তার আগে বাড়ি যাওয়া দরকার। বাড়ি গিয়ে ভরপেটে বাংলা মায়ের খাবার খাব বলে? না, বঙ্গাদেশীয় খাবারই সার কথা না। আমাকে তুর্কি কিছু খাবার ঢের বেশি টানে, তবু জিভের স্বাদ এখনো যেন বাংলার খালবিলে অনাদর অবহেলায় বেড়ে ওঠা গুঁড়া মাছে লেগে থাকে। মেরা পিঠার মোহ আমায় ছাড়ে না। এই সত্য অস্বীকারের উপায় কই?

হয় এয়ারপোর্টের ভেতরে বসে রাত কাটাতে হবে, না হয় কোনো এক হোটেলে। এয়ারপোর্টের ডরমিটরিগুলো বন্ধ। লকডাউনে বন্ধ পাবলিক যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা। আমি যাব এয়ারপোর্ট থেকে হরিদাসপুর তথা বেনাপোল সীমান্ত, বেনাপোল হয়ে 'রোল মডেল'-এর বাংলাদেশে। কিন্তু কী করে যাব, রাতটাইবা কোথায় কাটাব? নানা কিছু চিন্তা করছি এয়ারপোর্টের যাত্রী চেয়ারে বসে বসে। কী করে, কীভাবে জন্মভিটায় ফিরে এলাম সেকথা খানিক পরে হোক। তার আগে কেমন করে, কোথা থেকে কলকাতায় এলাম সেই কেচ্ছা শোনা যাক।

চণ্ডীগড় টু কলকাতা

চণ্ডীগড় ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের রাজধানী। রাজধানীর নামে হওয়া চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানিমেশন নিয়ে পড়তে গেছি। নামে চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এর অবস্থান রাজধানী শহর থেকে বেশ দূরে, এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। চণ্ডীগড় রাজ্য মহাসড়কের (এক্সপ্রেসওয়ে) পাশ ঘেঁষে গড়ে উঠেছে প্রদেশটির সবচেয়ে নামী ও নবীন এই শিক্ষায়তন। কয়েক শ একর জায়গা নিয়ে যে একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে তা চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় না দেখলে বাঙালির বিশ্বাস করার কথা না। বাঙালিও বিশ্ববিদ্যালয় নামক টং ঘর খুলে ব্যাবসা করে, পকেট কাটে; শিক্ষা নামক এসব ব্যবসাবাণিজ্যে সব রসদই আছে কেবল মিশন বা ভিশন নাই। ভারতীয়রা পয়সাও কামায় আবার জাতি গড়ার দায়িত্বও পালন করে। ভিশনারি না হলে এত বড়ো ক্যাম্পাস, নানান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। দক্ষতা উন্নয়নসহ শিক্ষার্থীদেরকে ঘিরে বছরব্যাপী চলে নানা কার্যক্রম। ফলে জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতের 'এ' ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে, তকমা লেগেছে এশিয়ার ফাস্ট গ্রোয়িং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। এক শিক্ষার্থীর ভাষ্যে–যাত্রা শুরুর পর কেবল তরতর করে উপরেই উঠছে এই ভার্সিটি, নিচে নামার বা থামার কোনো লক্ষণ নেই। ফলে কেবল সারা ভারত থেকেই শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসে না, পৃথিবীর অর্ধ শতাধিক দেশের ছেলে-মেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। শিক্ষাপণ্যের ডিজিটাল মার্কেটিংয়েও বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। তাই বলতেই হয়, নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও কাজে ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাংলাদেশেরগুলোর পার্থক্য বিস্তর।

এখানে পড়তে গিয়ে প্যারায় পড়েছি আসলে। সেসব গপ্প অন্য গল্পে হবে। আপাতত দেশে ফেরার মহাভারত কাহিনি। এর মধ্যে শুরু হয়েছে গ্রীষ্মের ছুটি (জুন-আগস্ট, ২০২১)। ভারতে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ থেকে নানাজন ক্রমাগত বলছিল–করোনায় মরতে হলে দেশে এসে মরো, ইন্ডিয়ায় কেন! দেশে ফিরলে আর কিছু না হোক কপালে মাটি তো জুটবে! পরীক্ষা শেষের অপেক্ষায় ছিলাম। জুনের ৩ তারিখ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আমি বিমানে চড়ে, গাড়িতে করে, তারপর হেঁটে দেশে ফেরার জন্য লাফ দিয়ে উঠলাম। ফেরার নানান প্রক্রিয়া অবশ্য বহু আগেই শুরু করেছি। হায় জীবন! আজ এই জায়গায় তো কাল ঐ জায়গায়। একটু থিতু হওয়ার সে কী আকাঙ্ক্ষা! তবু মানুষ কি পারে? নাকি এই হচ্ছে, হবে করে করে সাড়ে তিন হাত মাটির ছোট্ট ঘরে গিয়ে শেষ আশ্রয় নেয়! হায় মনুষ্য জীবন। হায় মানুষের জীবন! শালিকের, কোকিলের, কাকের জীবন কি মানুষের হয়! কী এমন ক্ষতি হতো, স্রষ্টা যদি মানুষকে উড়ে যাওয়ার দুটি ডানাও দিতেন! তাহলে অনেক দূরে উড়ে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পুড়ে মরার একটা সান্ত্বনাও হয়ত থেকে যেত।

মাতৃভূমির তৃষ্ণা

আমারও আজন্ম সাধ পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে, নানা দৃশ্যে নয়ন জুড়িয়ে অন্তত মরার আগে যেন বাংলাদেশের মাটির ছোঁয়া পাই! মধু কবির মতো হৃদয়ের এক পবিত্র আকুতি গোমতী নদীকে ঘিরে—

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

চিরতরে চোখ বোজার সময় শেষবারের মতো চোখ মেলে যেন দেখি শ্যামলিমা মহামায়া বাংলা মাকে। শেষ গোনার আগে কোকিলের না হোক কাকের কা-কা, চড়ুই পাখির কিচিরমিচির বা বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ শুনি। এটা কথিত শো-অফের দেশপ্রেম, সৎ রাজনীতিকদের মুখের বুলি, অতি করিৎকর্মা আমলাদের দায়িত্বজ্ঞান, এলিট সম্প্রদায়ের উচ্চমার্গীয় চেতনা বা হেনতেন গর্ব টাইপ কিছু না। এটা হচ্ছে—যে মাটিতে জন্ম সেই মাটিতে লীন হওয়ার প্রাণ মাত্রের সুপ্ত বাসনা। মানব মনের চিরায়ত এক চাওয়া—

তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুরের ঢেউয়ের আঘ্রাণ

লেগে থাকে চোখে মুখে।

জানি না এমন কোনো প্রাণ আছে কি না যার মনে জন্ম মাটি নিয়ে টান নেই। চোখ বন্ধ করলে জন্মস্থানকে চোখে দেখে না এমন কোনো প্রাণী হয় নাকি? ভারতে করোনায় করুণ বন্দি মানুষ। আমাদের জীবনও যেন এক আধামুক্ত জেলখানায়। কোথাও যাওয়া যায় না, কিছু করা যায় না, ঘর থেকে বের হতে চাইলে মাস্ক লাগানোর জোড়াজুড়ি। ফলে মরতে বা ঘুরতে এখন বাংলাদেশে চলে যাওয়াটাই আমার কাছে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

কিন্তু কীভাবে আসব?

কীভাবে?

কীভাবে?

করোনার প্রকোপ (২০২১ সালের এপ্রিল-মে-জুন দ্রষ্টব্য) বাড়তে থাকায় সীমান্ত বন্ধ হয়ে গেছে। একটা সময় পর্যন্ত ভারত আগ বাড়িয়ে সীমান্ত বন্ধ করত। এবার নাকি বাংলাদেশ করেছে! বিশেষ অনুমতি ছাড়া কাউকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আগে থেকেই বিমান চলাচল বন্ধ ছিল, এখন স্থলবন্দর দিয়েও চলাচল একরকম বন্ধ। বিশেষ পাস নেয়ার পর আছে করোনা পরীক্ষার ঝামেলা, তারপর গন্তব্যস্থলে পৌঁছা, পৌঁছানোর পর ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন।

এসব নিয়মের বেড়াজালে পড়ে একদিকে যেমন হয়রানি বাড়ছে, অন্যদিকে অতিরিক্ত পয়সা খরচ হচ্ছে। করোনা নিয়ন্ত্রণ বা করোনা বিধি প্রয়োগের বিকল্প ভাবনার অবকাশ আছে কি না ভেবে দেখা দরকার। এসব 'কড়াকড়ি ঘোষণায় দায়িত্ব সেরে' করোনা আসলে কদ্দূর কমানো যায় তা নিয়েও আমার সংশয় আছে। স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য নানানকলা কানুন করা হলেও স্বাস্থ্যবিধিটাই কেবল মানা হচ্ছে না, বাকি সব ঠিকই হচ্ছে। মানুষ ঠিকই কাঁধে কাঁধ রেখে গপসপ করে, খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, আড্ডা মারে, বাসে পাশাপাশি সিটে বসে করোনায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কতটা জরুরি তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে, এক রুমে এক খাটে জটলা পাকিয়ে সাবধানে চলাফেরার উপদেশ ভাগাভাগি করে। আজ দেশের কি অবস্থা, এখানে কার করোনা হলো, আর কে কে ১৪ দিন শেষ করে বাড়ি ফিরল এসব নিয়ে তুমুল উত্তেজনাকর মুহূর্ত উপহার দেয়! মানুষ এমনই জীব যে সে যা ভাবে তা করতে চায় না, আর যা চিন্তায়ও থাকে না তা করে বসে লাজুক হাসে। মানুষই এমনই জীব। আর সব ঠিক আছে, শুধু নিজ জীবন নিয়ে বেখেয়াল থাকে। সে সবই করে, খালি কাজের কাজটা বাকি থেকে যায়। মানুষ কেবল মনুষ্য জীব না আলস্য জীবও বটে!

বিশেষ পাস

বিশেষ পাস কীভাবে পেতে হয় জানি না। কয়েকজনের সাথে এটা নিয়ে কথা বলি, ফেসবুকে ঢুঁ মারি। এতটুকু বুঝতে পারি, বিশেষ পাসের জন্য বিশেষ মানুষের সাহায্য বা সুপারিশ দরকার। তা ছাড়া আরেকটা উপায় হচ্ছে গাঁটরিবোঁচকা নিয়ে কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে গিয়ে পড়ে থাকা। এর বাইরে পাস পাওয়া অনেকটা সোনার হরিণ পাওয়ার মতোই। মেডিক্যাল ভিসায় যারা ভারতে গিয়েছে এবং যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে কেবল তাদেরকেই পাস দেওয়া হচ্ছে। আমি তো গিয়েছি স্টুডেন্ট ভিসায় আর ভিসার মেয়াদও আছে। তবে ফেসবুক ঘুরে ঘুরে এটাও বুঝলাম হাইকমিশনে ভালোভাবে অনুরোধ করা গেলে পাস পাওয়া সম্ভব। এই ক্রাইটেরিয়ার বাইরেও কিছু পাস দেওয়া হচ্ছে, তবে এজন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা লাগবে।

বাংলাদেশে সাংবাদিক বন্ধু আসিফ আজীজ ভাইয়ের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করলাম। তিনি ভারতে *বাংলা নিউজ*-এর প্রতিনিধি সুদীপ চন্দ্র নাথের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুদীপদা বেশ আন্তরিক মানুষ। তিনি আগরতলাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে কথা বলে আমাকে জানালেন–এদিক দিয়ে আসতে চাইলে পাস পাওয়া যাবে, নো প্রবলেম। এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করলাম, কিন্তু আগরতলা হয়ে যাওয়া মানে দ্বিগুণ কষ্ট। আমাকে আগরতলায় যেতে হবে সেই কলকাতা হয়েই, এর বাইরে অন্য কোনো পথ নেই। যাওয়ার পর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ১৪ দিনের থাকার ব্যবস্থাও ততটা মানসম্মত হওয়ার কথা না। তার ওপর দেখা গেল, কি থেকে কি করলাম বা বলে বসলাম—এই নিয়ে দুই পক্ষের টোঁটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একটা টোঁটা উড়ে এসে থোঁতায় লাগলে উপায় আছে! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...ভারত শাখা ছাত্রলীগ নেতা সৈকত দেবনাথের সৌজন্যে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে কর্মরত জামাল ভাইয়ের (মিনিস্টার পদবি সম্ভবত) নম্বর পেলাম। তাঁর সাথে কথা বললাম, নিজে একসময় সাংবাদিকতা করতাম এই পরিচয়ও দিলাম। তিনি আমাকে ডকুমেন্ট ই-মেইল করতে বললেন। ই-মেইল করে তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলাম। কয়েকদিন চলে যায় খবর নেই। আবার ফোন দেই, আমাকে চিনতে পেরেছেন কি না জানতে চাই। আবার দেই, আবার। অবশেষে পাস পাই। তিনি নিজেই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। জামাল ভাইয়ের ব্যস্ততার কারণে হয়ত তাঁর সাথে খুব একটা কথা বলার সুযোগ হয়ে

ওঠে না, তবে তিনি পাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজেই হোয়াটসঅ্যাপ করলেন। বিষয়টা ভালো লাগল।

শেষ হইয়াও হইলো না শেষ

বিশেষ পাসের বিশেষ ধরনের গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। অনেকটা বাতাবি লেবু চাষে সারা দুনিয়ায় সারা ফেলে দেওয়া *বিটিভি*-তে আমাদের শৈশবে ইদের অনুষ্ঠান ঘোষণা দেওয়ার মতো হয়ে গেল আর কি। সেই সময়ের কথা—যখন বিদ্যুৎ ছিল না, ছিল না ঘরে ঘরে সাদা-কালো টিভিও। উপস্থাপিকা অনুষ্ঠানটি কার কার সৌজন্যে প্রচারিত হচ্ছে বলতে বলতেই আরেকবার সৌজন্যদাতাদের বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে যেত। সেই বিজ্ঞাপন শেষ হতে হতে হয়ত দেখা গেল ব্যাটারি শেষ। আরেকটা ব্যাটারি কই খোঁজার জন্য টর্চলাইট খোঁজা শুরু হলো। ইদের অনুষ্ঠান দেখবে বলে ঘরজুড়ে মানুষ। হইহই, রইরই পড়ে গেল। 'কি হলোরে', 'কে করলোরে' বলে তুমুল চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল। যাহোক, এত অল্পতে শেষ হয়ে গেলে বই লিখতাম কী দিয়ে! সুতরাং শেষ হয়েও হয় না শেষ, এই আমাদের বাংলাদেশ! এখানে আর কিছু হোক বা না হোক নাটকের অভাব হয় না। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন! গল্পের প্রয়োজনে সমস্যা বাড়তে থাকল, তার মধ্যে নিত্যনতুন সাসপেন্স যোগ হলো। আসলে ভেবেচিন্তে দেখি আমার জীবনটাই একটা গল্প হয়ে গেছে, ছোটোখাটো গপসপের বিষয়বস্তু। কোনো এক দার্শনিক নাকি বলেছেন–জীবন হলো একটা দুঃখের কুয়া। যে কুয়ার গভীরতা যত বেশি তার জীবন তত সুন্দর! গল্পের প্রয়োজনে সমস্যায় ফিরি। সরোজ মেহেদী, বেশি কথা না বলে কাজের কথা বলো। মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়। হোক বিরক্ত। প্রথম দিকে কিছুটা সময় পার করে দিয়ে মনে হতে পারে এসব গল্পকথা সব একঘেয়ে। তবে আরেকটু সামনে গেলে, অন্ধকার গুহা ধরে দিনের আলোয় আমার গল্প ফিরবে বলেই বিশ্বাস। চলেন দেখি তাহলে, তারপর কী হলো, কীভাবে কী করলাম—বিস্তারিত।

বিধি বাম! আমি বাংলাদেশে যাওয়ার (চণ্ডীগড় টু কলকাতা) টিকেট কেটেছি ৭ই জুনের। বাংলাদেশ সীমান্তে যেতে যেতে অন্তত ৮ তারিখ, কিন্তু আমাকে যে পাস দেওয়া হয়েছে তার মেয়াদ ৬ তারিখে শেষ। আমি ভেবেছিলাম এই পাস মাস কয়েক ব্যবহার করা যাবে। পাসের মেয়াদ যে মাত্র সাতদিন এটা খেয়াল করি নি। বিষয়টি নজরে আসলো শুক্রবার (৪ঠা জুন, ২০২১) দুপুরে। চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিভাগে বসে আছি ছাড়পত্রের